ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়

অশোক ভট্টাচার্য

নীহাররঞ্জন রায় এমন একটি নাম যার সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে বাঙালি তার সত্তার পরিচয় থেকে বঞ্চিত হবে। আমাদের জীবৎকালে বাংলাভাষায় যে কয়েকটি মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে নিঃসন্দেহে তার অন্যতম নীহাররঞ্জন রায় রচিত "বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব" (১৯৪৫)। এই ইতিহাসগ্রন্থটি শুধু বাংলা ভাষায় নয়, যে কোনোও ভাষায় ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত। ভারতের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার গ্রন্থের পরিচয়-পত্রের শুতেই লিখেছেন' "অধ্যাপক নীহার রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" একখানি অমূল্য গ্রন্থ। বহু বৎসর ধরিয়া ইহা আমাদের অবশ্য পঠিতব্য প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথনির্দেশ করিবে।" তিনি আর্য লিখেছেন "...যতদিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ গবেষণার ফল আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে বাঙালীর প্রাচীন জীবনের ইতিহাস আলোকিত না করিবে, ততদিন পর্যন্ত এই গ্রন্থের অতি উচচ আসন আরকেহ অধিকার করিতে পারিবে না, ইহার মর্যদা অক্ষুন্ন থাকিবে। ইতিহাসের যে বিরাট দৃশ্য এই গ্রন্থে উদঘাটিত এবং যে মহামূল্যবান বিভাগটি এই গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা বুঝিতে হইলে এই গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে পাঠ এবং নীহাররঞ্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্যগুলি বারবার আলোচনা করা ভিন্ন গতি নাই। এই গ্রন্থ আমাদের দেশের ইতিহাস আলেচনায় নূতন পথ রচনা ও নূতন আদর্শ স্থাপন করিল। পরবর্তী গবেষকেরা ইহাকে ভিত্তিরূপে লইয়া কাজ আরম্ভ না করিলে আমাদের নিজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিস্তার সম্ভব হইবে না।" আচার্য যদুনাথের এই কথা আজ থেকে অর্ধ - শতাব্দকাল পূবে গ্রন্থটি প্রকাশের সময় যেমন সত্য ছিল, আজও সমান সত্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

নীহারঞ্জন রচিত এই অনন্যপূর্ব ইতিহাসের চরিত্রটিও যদুনাথ অল্প কথায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন "এই গ্রন্থের নাম রাখা হইয়াছে বাঙলার ইতিহাসে নহে, বাঙালীর ইতিহাস ; অর্থাৎ ইহা বাঙালা দেশের রাজা, রাজকর্মচারী, যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন -বিস্তাতর প্রভৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্যে লিখিত নহে, কারণ, সেরূপ "এহ বাহ্য" ইতিহাস তো আগে অনেক লেখা হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙালীর লোক - ইতিহাস ; ইহাতে বাঙালীর জনসাধারণের, বাঙালী জাতির সমগ্র জীবন - ধারার যথার্থ পরিচয় দিবার জন্য আদ্যন্ত চেষ্টা করা হইয়াছে. সুতরাং বলা যাইতে পারে, এই ঐতিহাসিক কাব্যটির "নায়ক" রাজবংশ নহে, ধনীসমাজ নহে, পণ্ডিতবর্গ নহে, জাতীয় চিন্তার শিক্ষিত নেতাদের সমাজ নহে-- যাহাদের বলা হয় জনসাধরণ, যাহারা উচচ বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ও স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিরে , যাহারা রাষ্ট্রে দরিদ্র ভূমিহীন বা স্বল্প ভুমিবান প্রজা বা সমাজ - শ্রমিক তাহারই এই ইতিহাসের "নায়ক" যদিও নীহাররঞ্জন প্রথমোত্ত শ্রেণী ও সমাজের লোকেদের কথাও ভুলেন নাই, তাহাদের ইতিহাসও বাদ দেন নাই। এই নিম্নতর কিন্তু বৃহত্তম সামাজিক স্তরকে প্রধান আলোচ্য বিষয় করাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও অনন্যপূর্বত্ব।" এই মধ্যরীতির ইতিহাস গ্রন্থটির সাধারণ পরিচয়ও যদুনাথ তাঁর পরিচয় - পত্রে দিয়েছেন "অধ্যাপক নীহাররঞ্জনের বিরাট গ্রন্থের সমস্টারই বিষয়বস্তু হইতেছে বাঙালার লোকেদের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, ধর্মকর্ম, সংস্কৃতি, ধনসম্পদ প্রভৃতি। অর্থাৎ বাঙালী জাতি কি করিয়া ত্রমে ত্রমে আজিকার বাঙালীতে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার ত্রমে ত্রমে আজিকার বাঙালীতে বিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা। বাংলার লে

াকেরা একেবারে আদিতে কেমন ছিল, কখন কোথা হইতে আসিল এই ভূখণ্ডের নদ-নদী পাহাড় - প্রান্তর-বন - খাল - বিল কালক্রমে কিরূপে পরিবর্তিত হইল, তার ভৌগোলিক প্রভাব এই প্রদেশের বাসিন্দাদের মধ্যে কোথায় কি কি কাজ করিয়াছে, বাঙালীর দেহে কোন্ জাতির রক্ত কি পরিমাণে মিশিয়াছে, অতীত যুগের কোন্ কোন্ জাতির রক্ত কি পরিমাণে মিশিয়াছে. অতীত যুগের ভূমি সংস্কার, কৃষিপদ্ধতি, শিল্প- ব্যবসা- ব্যাণজ্য, অশন- বসন, ধর্ম ও ক্রিয়াকান্ড, শিল্প - বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, এককথায় প্রাচীন বাঙালী জীবনের সকল দিক হাজার বৎসর ধরিয়া কালের স্রোতের আঘাতে কেমন করিয়া ভিন্ন ভিনান্ন রূপ লইল--- এই সব তলাইয়া বুঝিবা চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে, এবং আমার সংশয় নাই, নীহাররঞ্জনের চেষ্টা অসামান্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।"

ঐতিহাসিক কুলপতি যদুনাথের বিশ্বাস যে যথার্থ, তা আজ "বাঙালীর ইতিহাস অদিপর্ব" প্রকাশের অর্ধশতাব্দকাল পরে সম্যকভাবেই প্রমাণিত হয়েছে । কেননা তুলনীয় কোনও ইতিহাস পরবর্তী দশকগুলিতে শুধু বাংলার নয়, অন্য কোনও প্রদেশেরও কোনও যুগ নিয়ে রচিত হয়নি। বলা বাহুল্য, ইতিহাসের নানা দিকে নানা জনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিমধ্যে যোগ্যতার সঙ্গেই আলোচনা করেছেন, এবং তার ফলে বহু মূল্যবান আবিষ্কার এবং বিশ্লেষণে ভারতীয় ইতিহাস বিস্তারে ও গভীরতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু নীহাররঞ্জনের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যে সমাজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দিক থেকে সমকক্ষ বা উন্নততর কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি হয়নি। এটা পরবর্তীকালেরঐতিহাসিকদের যতখানি না অগৌরব, আমার মনে হয়, তার তুলনায় অনেক বেশি গৌরব প্রবাদপ্রতিম ঐতিহাসিকনীহারঞ্জনের ।

।। ২ ।।

"বাঙালীর ইতিহাস" নীহাররঞ্জন রায়ের জীবনসাধনার ফসল। এই গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতি তাঁর দীর্ঘদিনের এবং তা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত পুঁথিগত বিদ্যার সূত্রেই নয়। তার প্রেরণাও অধীতবিদ্যাপ্রসূত নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই আমাদের অবহিত করেছেন গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধস্বরূপ "নিবেদনে"। তিনি লিখছেন "যত অধ্যয়ন, বীক্ষণ, মনন, আলোচনা ও গবেষণাই এই গ্রন্থের পশ্চাতে থাকুক বা না থাকুক, জ্ঞানস্পৃহা আমাকে এই গ্রন্থ - রচনায় প্রবৃত্ত করে নাই। প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেগ এবং স্বদেশব্রতের দুর্দম দুরন্ত নেশায় বাঙলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। তখন বিস্তৃত বাংলার কৃ ষকের কুটিরে, নদীর ঘাটে,ধানের ক্ষেত্রে, বটের ছায়ায়, শহরের বুকে, নির্জন প্রান্তরে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায় এই দেশের এবং এই দেশের মানুষের একটি রূপ আমি দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। পরিণত যৌবনেও বারবার বাঙলার ও ভারবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত যুরিয়াছি। নানা প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে ; আজও তাহার বিরাম নাই। যত দেখিয়াছি, যত নিকটে গিয়াছি ততই সে ভালবাসা গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। এই ভালবাসার প্রেরণাতেই আমি এই গ্রন্থ - রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, ভালবাসাকে জ্ঞানের বস্তুভিত্তিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে। দেশকে আরও গভীর ও নিবিড় করিয়া পাইরার উদ্দেশ্যে। আমার বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতি প্রাচীন পুঁথির পাতায় নাই, রাজকীয় লিপিমালায়ও নয়, সে-দেশ ও জাতি আমার চোখের সম্মুখে ও হৃদয়ের মধ্যে বিস্তৃত ও বর্তমান। প্রাচীন অতীত আজিকার সদ্য বর্তমানের মতই আমার কাছে সত্য ও জীবন্ত। সে সত্য জীবন্ত অতীতকে আমি ধরিতে চাহিয়াছি এই গ্রন্থে, মৃতের কঙ্কালকে নয়।" এই কয়েকটি ছত্রে দেশকর্মী নীহাররঞ্জন গ্রন্থটি রচনার প্রকৃত প্রেরণাকে ও উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্টভারে চিহিত করেছেন। সহস্রাধিক পাতার এই মহাগ্রন্থের সুখপাঠ্যতার অন্তনির্হিতশক্তি, চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে বাংলার কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, মাঝি - মাল্লা ও কারিগরদের জীবনধারা ।তাদের সঙ্গে যে একাত্মতাবোধ তিনি অনুশীলন সমিতির কর্মী হিসাবে অর্জন করেছিলেন, তার প্রেরণাতেই এমন দুরূহ কাজে ব্রতী হয়ে দীর্ঘ শ্রমে ও সাধনায় সে কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন । "বাঙালীর ইতিহাস" -- এর চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে তাঁর এই যৌবনের অভিজ্ঞতা থেকেই।

কিন্তু কোনওবড় অনুপ্রেরণাই, তা সে যতই ভালবাসা ও আবেগসঞ্জাত হোক না কেন, সার্থক ইতিহাস রচনার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে না। কারণ ইতিহাস প্রামাণ্য তথ্যনির্ভর, ইতিহাসকার তাঁর কবিকল্পনায় সেই তথ্যভিত্তি থেকে ইচ্ছা মতো দূরে সরে যেতে পারেন না--- এই কঠিন সত্য মেনেই ইতিহাস রচিত হয়ে আসছে । আবার এও সত্য যে কবিকল্পনা ছাড়া

ঐতিহাসিক কোনও যুগকে কেবলমাত্র তথ্যপ্রমাণের বিচারে ও বিবরণে সজীব ও আকর্ষণীয় করে তোলা য়ায না। ঐতিহা সিকের সাফল্যের পিছনে কাজ করে তাঁর কল্পনাশক্তি ও তথ্যনির্ভর মননশীল যুক্তিপ্রবণতা। নীহারঞ্জনও এ বিষয়ে পূর্ণত সচেতন ছিলেন। তাই পরবর্তীকালে 'ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা' নিবন্ধে লিখেছেন 'জনপ্রবাহ যে ইতিহাস পায়ে পায়ে রচনা করে চলে তারই দুই চারটি ক্ষুদ্র ছিন্ন অংশ নিয়ে বহুদিন, বহু যুগ, বহু শতাব্দী পর ঐতিহাসিক তাঁর নিবন্ধ-- প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি রচনা করেন। সমগ্র জীবনপ্রবাহটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগই তাঁর ঘটে না, সুতরাং 'whole truth' দেখতে পাবার, বলতে পারার প্লটাই এক্ষেত্রে অবান্তর। ঠিক এই কারণেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা নিবন্ধ রচনায় ঐতিহাসিক কল্পনা বা হিস্টোরিক্যা াল ইমাজিনেশনের কথাটা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। সুদুর্লভ এই কল্পনাশক্তি বহু আয়াস বহু অভ্যাস বহু অভিজ্ঞতা ছাড় া লাভ করা যায় না।"

নীহাররঞ্জনের জীবন অনুধাবন করলে আমরা জানতে পারি কত অভিজ্ঞতার পথ পেরিয়ে তিনি "বাঙালীর ইতিহাস" রচন া প্রবৃত্ত হয়েছিল। তণ বয়সে তাঁর দেশকর্মী হিসাবে নিজেকে নিযুক্ত করা এবং দেশের মুক্তি অর্জনের জন্য বিপ্লবী 'অনুশীলনসমিতি'স সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ইতিপুর্বেই উল্লেখ হয়েছে। এখানে এও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে এই র াজনৈতিক ভূমিকার জন্যই তাঁকে নিজের জেলা মৈমনসিংহ ছেড়ে, বাংলা প্রদেশ ছেড়ে, ততানীন্তন আসাম প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট সিলেট -এর জেলা শহর মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে স্নাতক হতে হয়। অনার্স-সহ বি.এ পাশ করে, ইংরেজ সরকারের দু-বছরের বহিস্কারকাল উত্তীর্ণ হওয়ায়, তিনি কলকাতায় এসে ৰিবিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে এম. এ পড়েন এবং প্রথম শ্রেনীতে প্রথম হয়ে ১৯২৬ সালে উত্তীর্ণ হন। এরপর শু হয় তাঁর গবেষকের জীবন। কোনও পাকা চাকরি না - পাওয়ার কারণে তখন স্কলারশিপের কিছু টাকা ও সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় অ াংশিক সময়ের সাংবাদিকতার রোজগারে তাঁকে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে হত। প্রথম তিনি স্বনামধন্য ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর অধীনে প্রাচীন ভারতে রাজবংশাবলী ও রাজবৃত্ত নিয়ে গবেঘণা করে কনৌজের মৌখরী, বলভীর মৈত্রক ও পশ্চিম ভারতের প্রতিহারদের প্রসঙ্গে তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' পড়ার সময় তিনি তাঁর বিশেষ বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন শিল্পকলারইতিহ াস। এই সূত্রে তিনি স্টেলা ক্রামরিশ, বেনীমাধব বড়ুয়া ও জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষকদের ছাত্র হওয়ার সুযোগ পান এবং তাঁদের শিক্ষণ থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। গবেষণার উদ্দেশ্যে তিনি বেণীমাধব বড়ুয়ার সঙ্গে তদানীন্তন ব্রহ্মদেশে গিয়ে সেখানকার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা গভীরভাবে অনুশীলন করেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁর প্রথম দুটি গবেষণা গ্রন্থ Brahamanical Gods in Burma: A chapter of Indian Art and Iconography (1932) & Sanlkrit Buddhism in Burma (1936). এবং পরবর্তী সময়ে An introduction to the study of Theravada Buddhism Burma (1946) প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া তিনি প্রাচীন বৌদ্ধ শহর পাগানের আনন্দ মন্দিরের চিত্রকলা বিষয়েও একটি মনোজ্ঞ গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন।

এই সব গবেষণার মধ্য দিয়ে নীহাররঞ্জন রাজবংশ ও রাজবৃত্ত, ধর্ম ও কলাশিল্প বিষয়ে কীভাবে অগ্রসর হতে হয় তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এর পর তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Maury A Sunga Art (1945) প্রকাশিত হলে তিনি ভারতের ঐতিহাসিকদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এই গ্রন্থটি শিল্প - ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ পরিচয় বহন করে। গ্রন্থটি সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করব।

প্রাচীন ভারতীয় তথা দেশকাল নির্বিশেষে ইতিহাস অধ্যয়নের পাশাপাশি অপর যে বিষয়ে নীহাররঞ্জন অধিকার অর্জন করেছিলেন, তা হল সাহিত্য । প্রথম যৌবন থেকেই তিনি একই সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ক আলোচনা প্রবাসী, ৰিবাণী, আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা Modern Review, Journal of the Indian Society of Oriental, প্রভৃতি পত্রিক ায় নিয়মিত প্রকাশ করতেন। কিন্তু সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ স্বীকৃতিলাভ যে গ্রন্থটির জন্য, তা হল "রবীন্দ্র

সাহিত্যের ভূমিকা'' (১৯৪১)। প্রায় পাঁচশো পাতার এই গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সাহিত্যকীর্তির বৈচিত্য, বৈশিষ্ট্য ও বিস্তারের এক পূর্ণাঙ্গ রসসমৃদ্ধ পযালোচনা উপস্থিত করেছেন। বিস্তৃতবিষয়কে যথাযথ অনুধাবন ও নিজস্ব যুক্তি শৃঙ্খলায় সুবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করার অধিকার যে তিনি ''বাঙালীর ইতিহাস'' রচনার আগেই অর্জন করেছিলেন, এই গ্রন্থটি তার সাক্ষ্য।

এই ভাবেই যৌবনকাল থেকে পরিভ্রমণ ও গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে তাঁর মহৎ কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু ''বাঙালীর ইতিহাস'' শুধু বিস্তার কিংবা বিন্যাসেই মহৎ নয় তার অন্তর্নিহিত ভাবনায় ও ব্যাখ্যায় যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়, তাকে ঠিক মতো অনুধাবন করলেই ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জনের যার্থার্থ পাওয়া যাবে

।। ৩ ।।

''বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব'' --এর ভূমিকায় নীহারঞ্জন লিখেছেন ''আমি কোনও নূতন বিশালিপি বা তাম্রপট্টের সন্ধ ান পাই নাই, কোনও প্রাচীন গ্রন্থের খবর নূতন করিয়া জানি নাই, কোনও নূতন উপাদান আবিষ্কার করি নাই।যে সমস্ত প্র াচীন গ্রন্থ বা লেখমালা অপেক্ষা করিতেছে নানা গ্রন্থাগার ও চিত্রশালায়, যে সমস্ত তথ্য ও উপাদান পণ্ডিতমহলে অল্পবিস্তর পরিচিত ও আলোচিত, প্রায় তাহা তাহাহইতে আমি সমস্ত তথ্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি।'' তারপর পূর্বসূরী ঐতিহাসিকদের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করে, এবং তাঁদের গৌরব ঘোষণা করে তাঁর এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস কেন, তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন ''আমি শুধু প্রাচীন বাঙলার ও প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস একটি নূতন কার্যকারণসম্পর্কগত যুক্তিপরম্পরায়, একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়ে বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি মাত্র। এই যুক্তিপারম্পর্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক যুক্তি ও দৃষ্টি বলিয়া আধুনিক ঐতিহা সিকেরা বিশ্বাস করেন, আমিও করি। আমার বিশ্বাস, এই যুক্তি ও দৃষ্টি অনুসরণ করিলে প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের যে স ামগ্রিক সর্বতোভদ্র রূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অন্য উপায়ে সম্ভব নয়।''

নীহারঞ্জনের নিজস্ব স্বীকৃতিতেই আমরা জানতে পারি তাঁর ''বাঙালীর ইতিহাস'' নতুন তথ্য ও উপাদান নির্ভর নয়। তার প্রকৃত নির্ভর গুত্ব ইতিহাসের ব্যাখ্যার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর মতে, সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ এত দিন পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাসচর্চার যে মূল ধারা উনিশ শতকের ইংল্যান্ডের প্রচলিত ধারার আদশে রচিত ও অ ালেচিত হয়ে এসেছে, তার থেকে স্বতন্ত্র। এত দিন পর্যন্ত বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় প্রাধ্যন্য পেয়েছে রাজবংশ াবলী ও রাজ্যশাসন, যদিও কোনও পণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে সমাজ, ধর্ম ও শিল্পকলা বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। তাঁর গ্রন্থ রচিত হওয়ার আগেই প্রকাশিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত History of Bengal (১৯৪৩)। এই প্রামাণ্য গ্রন্থটিতে সম্পাদক মহাশয় তাঁর প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাচীন বাঙলার এক সামগ্রিক পরিচয় পরিবেশন করেছেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সমবেত করে। গ্রন্থের সতেরোটি অধ্যায়ে পণ্ডিতগণ আলোচনা করেছেন যথাক্রমে বাঙলার ভৌগোলিক পরিচয়, আদিকাল থেকে ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দ পযন্ত র াজনৈতিক ইতিহাস, শাসনব্যবস্থা ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্পকলা। রচনাগুলির প্রামাণ্যতা ও বিশ্লেষণ অর্ধশতাব্দকাল পরেও পণ্ডিতসমাজে গ্রন্থটিকে অপরিহার্য করে রেখেছে। এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরেও, এবং সে- গ্রন্থে নিজেও একটি মূল্যবান অধ্যায় রচনা করেও, নীহাররঞ্জন তাঁর ''বাঙালীর ইতিহাস'' লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কেন, সে কথাও তিনি তাঁর ভূমিকায় স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত History of Bengal -কে ''ব াঙলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিগত ৭৫ বৎসর সম্মিলিত গবেষণার সমষ্টিগত ফল'' এবং ''বাঙালী পাণ্ডিত্য ও মনীষার গৌরব'' আখ্যা দিয়েও তিনি তাঁর ''বাঙালীর ইতিহাস'' রচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ''কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙলার এই ইতিহ াসকে বাঙালীর ইতিহাস বোধ হয় বলা য়লে না। প্রথমত, ইতিহাসের কোনও যুক্তি, কার্যকারণ - সম্বন্ধের কোনো ব্যাখ্যা ব া ইঙ্গিত এই ইতিহাস রচনার পাশ্চাতে নাই, তাহা না থাকিবার ফলে প্রত্যেকটি অধ্যায় সুপরীক্ষিত, সু-আলেচিত ও তথ্যবহুল হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালীর জীবনধারার যথার্থ পরিচয় ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত,

প্রাচীন বাঙলায় যাহাদের বলা যায় জনসাধারণ, যাঁহারা বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাহিরে অথবা বৌদ্ধধর্মের বাহিরে, যাহারা রাষ্ট্রের দরিদ্র ভূমিহীন প্রজা বা স্বল্পভুমিবান প্রজা বা সমাজ শ্রমিক তাঁহাদের কথা এই গ্রন্থে যথেষ্ট স্থান পায় নাই, অথচ তাঁহারাই যে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এ সম্বন্ধে তো সন্দেহ নাই। যে লোকধর্ম লৌকিক দেবদেবী, গ্রাম্য জনসাধারণের জীবনযাত্রা, গ্রামের সঙ্গে নগরের পার্থক্য ও যোগাযোগের অধিকতর তথ্য, যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সমগ্র জীবনধারা পূর্ণতর ও উজ্জ্বলতর করিতে পারিত, তাহা পরিপূর্ণ মর্যাদায় এই গ্রন্থভূক্ত হইতে পারে নাই। সত্য বটে, ইহাঁদের কথা বলিবার মতো যথেষ্ট তথ্য হয়তো আমাদের সম্মুখে নাই, তবু , যতটুকু জানা যায় ততটুকু অন্তত প্রাচীন বাঙলাদেশকে বেশি জানা । তৃতীয়ত, এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায় বিচ্ছিন্ন, একে অন্যের সঙ্গে অপরিহার্য সম্পর্কসূত্র গ্রথিত নয়।" অথচ, তাঁর মতে, "রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আর্থিক বিন্যাস প্রভৃতি সমস্ত কিছুই গড়িয়া তোলে মানুষ, এই মানুষের ইতিহাসই যথার্থ ইতিসাস। এই মানুষ সম্পূর্ণ মানুষ, তাহার একটি কর্ম আর একটি কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে দেখা ও পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না, একটি কর্মের সঙ্গে অপরাপর কর্মকে যুক্ত করিয়া দেখিলে তবেই তাহার সম্পূর্ণ রূপ ও প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। দেশকালধৃত মানুষের সমাজ সম্বন্ধেও একথা সত্য ও সর্বত্র স্বীকৃত। এই সত্য স্বীকৃতি না পাইলে ইতিহাস যথার্থ ইতিহাসহইয়া উঠিতে পারে না।"

নীহাররঞ্জন যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপরোক্ত কথাগুলি লিখেছেন, তা তিনি ঝিবিদ্যালয়ের মান্য পণ্ডিতশিক্ষকদের কাছ থেকে শিখেছিলেন এমন নয়। ঝিবিদ্যালয়ের এক এক জন শিক্ষক পাঠত্রমের এক - একটি বিষয়কে ছাত্রদের সামনে বিশদ ও অনুপুঙ্খভাবে উপস্থিত করতেন, ইতিহাস রচনার পদ্ধতি প্রকরণ সম্পর্কে অবহিত করতেন, এবং এই শিক্ষণের মাধ্যমে গবেঘণার প্রাথমিক পাঠও দিতেন। কিন্তু দৈবাৎই কোনও শিক্ষক সমাজ - মানসের বিভিন্ন জাগতিক ও মানসিক দিকগুলিকে এক অবিচ্ছিন্ন, পারস্পরিক ও কার্যকারিতাযুক্ত অভিব্যক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষত, প্রাচীন সমাজ ও শিল্প- সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করলেও, ধনোৎপাদন ও ধনবন্টন, এবং বর্নশ্রম সমাজরীতির বাইরের সাধারণ মানুষ, ইত্যাদিও তাঁরা আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করেননি। এই শিক্ষা নীহাররঞ্জন স্বয়ং অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রথমে রাজনৈতিক জীবনের দেশপরিত্রমার মাধ্যমে দেশের জনবিন্যাস ও গ্রামসমাজকে জেনেছিলেন, এবং সেই সঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের সাহায্যে , তাঁর নিজস্ব ইতিহাস-- চিন্তাকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বিশেষ চিন্তাকেতিনি নিজেই মাজবৈজ্ঞানিকের চিন্তা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

"বাঙালীর ইতিহাস" রচনার কয়েক বছর পর বিনয় ঘোষ রচিত "পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি" তে "আলোচনা" নামক সংযোজনে নীহাররঞ্জন 'ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি ' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে তাঁর ইতিহাস রচনার নতুন যে ভাবনা তা তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন "সাধারণত যে - বিদ্যার উপায়ও পদ্ধতি অবলম্বনে আমরা অতীত ও বর্তমানকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করি, তার নাম ইতিহাস। ইতিহাস - শাস্ত্রর সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয় বহু প্রাচীন কাল থেকেই। কিন্তু আধুনিক মানুষ আবিস্কার করেছে, শুধু এই শাস্ত্রের সাহায্যে সে অতীত ও বর্তমানের যে- জ্ঞান লাভ করে তা আংশিক মাত্র। কারণ, স্মৃতির প্রবাহ ছাড়া অন্য সূত্রেও অতীত বাহিত হয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছয়, এবং তাকে প্রভাবিত করে ভবিষ্যতের রূপান্তর ঘটাতে।" এই সূত্রগুলির মধ্যে তিনি প্রথমেই গুত্ব দিয়েছেন রক্তপ্রবাহকে, যাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন মানবধারা পৃথিবীর বুকে সঞ্চারিত হচ্ছে। এই শাস্ত্রের নাম নরতত্ত্ব বা নৃশাস্ত্র, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'অ্যানথ্রপলজি', বা সামান্য অর্থান্তরে 'এথনলজি'। নৃতত্ত্ব ছাড়া আধুনিক যে শাস্ত্রকে তিনি সার্থক ইতিহাস রচনায় বিশেষ কার্যকরী বলে মনে করেছেন, তা হল সমাজতত্ত্ব বা সমাজ শাস্ত্র, ইংরেজিতে যা সাধারণত সোসাল সায়েন্স বা 'সোসিওলজি' বলে স্বীকৃত। এই বিষয়গুলি আজও বিশ্বের বিভিন্ন ঝিবিদ্যালয়ে পৃথক পৃথক শাস্ত্র হিসাবেই পঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিকালের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রবণতাও ত্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছে, যত দিন যাচ্ছে তত যেন বিভিন্ন বিষয়ে ভেদরেখা ঘুচে যাচ্ছে, একাধিক শাস্ত্রের সাহায্য যে- কোনও একটি বিষয় অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উছছে। এর ফলেই অধুনা প্রত্নতত্ত্ব (আর্কেওলজি) ও নৃতত্ত্ব (এথনলজি) সমন্বিত বিষয় হিসাবে চর্চিত হচ্ছে নামনৃ - প্রত্নতত্ত্ব বা এথনো - অ

র্কেওলজি। নীহাররঞ্জন আজ থেকে অর্থশতাব্দকাল আগেই চর্চার এই সমন্বিত প্রয়োগে সূত্রপাত ঘটিয়ে ছিলেন তাঁর "ব াঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব - এ।"

সমাজবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশকালের ইতিহাসচর্চায় ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজন এবং আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের গুত্ব তিনি তাঁর এই নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। বিনয় ঘোষ মহাশয় এই পথের পথিক । তাঁকে একজন সম াজবৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের স্বীকৃতি দিয়েছেন নীহাররঞ্জন।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন তাঁর এই গুত্বপূর্ণ নিবন্ধটি শেষ করেছেন এই বলে "আমার এই যুক্তির অর্থ এ নয় যে,প্রত্নসাক্ষ্য ও সমসাময়িক দলিলপত্রের তথ্যাদি গ্রাহ্য বা নির্ভরযোগ্য নয়। মূখসুলভ এই যুক্তি একেবারেই আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রত্নস াক্ষ্য ও ঐতিহাসিক দলিলপত্রের তথ্যাদির মূল্য ও মর্যাদা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, সে - সাক্ষ্য ও ত্যদির সম্পূর্ণ অর্থ ও প্রকৃতি সুস্পষ্ট ততক্ষণ হতে পারে না যতক্ষণ তার উপর আমরা সমাজশাস্ত্রের রীতিনীতি গতিপ্রকৃতি ও উপায়পদ্ধতি প্রয়োগ না করি । এ-যাবৎ আমরা বহুলাংশে তা করিনি বলে আমাদের ইতিহাস রচনাও বহুল াংশে ত্রনিক্‌ল্‌-স্তর উত্তীর্ণ হয়ে সার্থক ইতিহাসের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। ত্রমশ এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক, আমার ইতিহাসলুব্ধ চিত্তের এই কামনা।" ইদানীং নীহাররঞ্জন কাঙ্ক্ষিত ধারার ইতিহাসচর্চা ত্রমশই তণ গবেষকদের মধ্যে প্রসার লাভ করছে। কিন্তু তিনি যেভাবে নানা সম্পর্কিত শাস্ত্রে সমন্বয়ে ইতিহাস রচনার পথনির্দেশ করেছেন, সেই ভ াবে তার তুল্য বাংলার অন্য কোনও যুগের বা ভারতের অন্য কোনও অঞ্চলের সামগ্রিক কাযকারণ সম্পর্কযুক্ত সম াজবৈজ্ঞানিক বা মানবিক ইতিহাস এখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। তাঁর প্রয়াসের পঞ্চাশ বছর পর আমাদের তৎপর হওয়ার সময় এসেছে।

।। ৪ ।।

বাংলাভাষার পাঠকদের কাছে নীহাররঞ্জন রায়ের প্রধান পরিচয় "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক হিসাবে, যদিও তার আগেই তাঁর অপর গুত্বপূর্ণ গ্রন্থ "রবীন্দ্র সাহিত্যের ভুমিকা" তাঁকে বাঙালি শিক্ষিতসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। "বাঙালীর ইতিহাস" যে তাঁর এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি সে - বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু নীহাররঞ্জনের ইতিহাসঅন্বেষা এই গ্রন্থের পরিধিতেই নিঃশেষিত হয়নি। এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে যেমন, পরেও তিনি ভারতেতিহাসের নানা যুগ ও নানা ব্যক্তির বিশ্লেষণাত্মক পর্য ালোচনা করেছেন। বাস্তবিকই, তাঁর জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতা বিস্ময়কর। তিনি ভারতের প্রাগৈতিহাসিক থেকে প্রাচীন, প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে, এবং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে অনায়াসে বিচরণ করেছেন। বিষয় হিসাবে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য এবং সবিশেষে শিল্পকলার বিচার করেছেন। তাঁর এই সুবিস্তৃত কাজের মূল্যায়ন তো দূরের কথা, সাধারণ সমীক্ষাও বর্তম ান লেখকের সাধ্যাতীত । সেই প্রচেষ্টায় না-গিয়ে তাঁর বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই এই নিবন্ধে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা অবশ্যকর্তবা যে নীহাররঞ্জন বাঙালি পাঠকদের কাছে "বাঙালীর ইতিহাসের" জন্য আদৃত হলেও, ইংরেজি ভাষার পাঠকদের কাছে তাঁর পরিচয় প্রধানত শিল্প - ঐতিহাসিক হিসাবে। শিল্প - ইতিহাসের বিশেষ ক্ষেত্রে, ভারতের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকলা আলোচনায় তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে আনন্দ কুমারস্বামী ও স্টেলা ক্রামরিশের সারিতেই। আনন্দ কুমারস্বামী ভারতীয় শিল্পকলার প্রধান ব্যাখ্যাতা হিসাবে বিশ্বময় পরিচিত, এবং বহুল পঠিত। তাঁর রচন ার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও উপকৃত হয়নি, এখন কোনও গবেষক এ পথের পথিক হয়েছেন বলে জানা যায় ননা। কুমারস্বামী তাঁর শ্র মে ও সাধনায়, এবং সম্ভবত ধ্যানে, ভারতীয় শিল্পকলার গভীরে প্রবেশ করে তার আত্মিক পরিচয় সকলের কাছে ব্যক্ত করেছেন। তিনি ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার রূপশৈলীর বিচারে যুক্ত করেছেন তাদের ধর্মীয় তাৎপর্য, এবং প্রয়ে াজনে সেই আলোচনাকে আধ্যাত্মিকতার স্তরেও নিয়ে গেছেন। ভারতীয় শিল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ, তার প্রতীকী তাৎপর্য এবং ভারতীয় সমাজজীবনে তার ভূমিকা--- এ সবই তিনি তাঁর গ্রন্থের ও নিবন্ধে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে আলোচনা করেছেন।

কুমারস্বামী ভূবিদ্যার শিক্ষা নিয়ে তদানিন্তন সিংহলের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালাবার সময় প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির ও ভাস্কর্য দেখে আকৃষ্ট হন এবং সেই আকর্ষণই তাঁকে কালক্রমে সিংহলের প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্যকলার উৎস সন্ধানের পথে ভারতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে টেনে আনে। ভারতশিল্পকে সম্যকভাবে জানবার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সকল বিদ্যায় অধিকার অর্জন করেন এবং তারই বিস্তৃত পাটভূমিকায় ভারতশিল্পের ব্যাখ্যা দেন। তিনি এক অর্থে ভারতীয় শিল্পভাষার উদ্ধারক।

তুলনায় স্টেলা ক্রামরিশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তুলনামূলক শিল্প - ইতিহাসে। তিনি ভিয়েনা ঝিবিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষকদের কাছে ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রথমিক পরিচয় পেয়ে তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ঝিবিদ্যালয়ের ভ ারতীয় ভাস্কর্য বিষয়ে তাঁর একটি বক্তৃতা শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ঝিভারতীতে আহ্বান করেন। সেই সূত্রে তিনি বাংলায় এসে বাংলার পন্ডিদের সংস্পর্শে ও নিজের অধ্যবসায়ে ভারতীয় রূপকলার এক অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যাতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রধান কাজ ইউরোপীয় নান্দনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পভাষাকে যুক্ত করে তার শৈলীর বিচ ার। ভারতীয় ভাস্কর্যকলা ও চিত্রকলার শৈলী বিচারে তাঁর আলোচনাই আজ পর্যন্ত সর্বোত্তম । এই শৈলীবিচারে তাঁর স াক্ষাৎ ছাত্র নীহাররঞ্জন তাঁর পথই অনুসরণ করেন। পরবর্তীকালে ক্রামরিশ নিজেকে শিল্পের দার্শনিক ব্যাখ্যায় নিয়োজিত করেছিলেন।

নীহাররঞ্জন শিল্পকলার ইতিহাসচর্চাতেও তাঁর পূর্বসূরীদের গবেষণা থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করেও নতুন পথের সন্ধানী হন। তিনি প্রাচীন ও আদি - মধ্যযুগের ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে তাঁর সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তার শৈলীর ন ান্দনিক দিকটিকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর দীর্ঘ গবেষণা - জীবনে কলাশিল্পের আলোচনায় তিনি অন্যান্য মাত্রা যুক্ত করলেও, এ ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই ঐতিহাসিক বিচার। তিনি শিল্প- ঐতিহাসিক হিসাবে যে গ্রন্থটির দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, সেই Maurya and Sunga Art পাঠ করলে এই সত্য উপলব্ধ হবে।

এই বইটিতে ভারতীয় শিল্পকলার আলোচনা সর্বপ্রথম বিস্তৃত সামাজিক পটভূমিকায় উপস্থিত করা হয়েছে। 'সামাজিক পটভূমিকা' অধ্যায়ে তিনি যে কেবল রাজনৈতিক প্রেক্ষিত আলোচনা করেছেন এমন নয়, সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন শিল্পী-কারিগরদের মাধ্যমে ব্যবহার, তাদের করণকুশলতা ইত্যাদিও। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও তাঁর পরবর্তী দুই সম্রাট আলেকজান্ডারের হাতে ধবংসপ্রাপ্ত পারস্য সাম্রাজ্যের আদর্শ, এবং ওই সাম্রাজ্যের দারিয়ুস প্রমুখের উদাহরণ তাঁদের সাম্রাজ্যে পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয় কলাশিল্পকে মধ্যপ্রাচ্যের কলাশিল্পের সঙ্গে তুলনা করে বিচার তাঁর আগেই সুচিত হয়েছিল। কিন্তু তিনিই সেই তুলনাকে রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষিতে রূপশৈলীর তুলন ার সঙ্গে সার্থকভাবে যুক্ত করেছিলেন। তিনি মৌর্যশিল্পের বিচারে তার শ্রেষ্ঠত্বকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনই দেখিয়েছেন রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় এককেন্দ্রিকভাবে সৃষ্টির ফলে, বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব, তা জনজীবনে প্রকৃত প্রতিষ্ঠা পায়নি। ফলে মৌর্য কলাশিল্পের পরম্পরাও পরবর্তী ভারতীয় শিল্পকলার বিবর্তনে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। সেই তুলনায় বহুজনের পৃষ্ঠপো ষকতায় এবং নানা কেন্দ্রে বিকশিত শুঙ্গ ভাস্কর্যকলা কী সংখ্যায় কী তাৎপর্যে ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসে অধিকতর গুত্ব দাবি করেছে।

নীহারঞ্জন তাঁর এই সম্ভবত সব চেয়ে গুত্বপূর্ণ শিল্প- ইতিহাসটির ভূমিকায় তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটি ব্যক্ত করেছেন, তিনি লিখেছেন Let me at the outset make it clear that I am not bringing to light any fresh find, and I am trying to say anything striking by original as to the character or form of the art of the two periods under review. My aim is to read this art in the larger context of life and hence as a related phenomenon, I.e. as one of the aspects of our cultural life in that distant past… Frankly, my method is sociological. I have therefore taken into consideration the current tastes and

preferences, individual and collective, the social background, the political circumstances, the trend of thoughts, ethnic components, root forms, traditions, influences, history of technique etc, to elucidate the coming into being of what we call Maurya and Sunga. Art."

তাঁর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় শিল্পকলার বিচারক্ষেত্রে তিনি কীভাবে তাঁর নিজস্ব ঐতিহাসিক সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। শিল্পকলাকেও তিনি আনন্দ কুমারস্বামীর পাণ্ডিত্যপুর্ণ দার্শনিক বিচার ও স্টেলা ক্রামরিশের সূক্ষ্ম রূপশৈলীর বিচার থেকে সমাজজীবনের বৃহত্তর পটভুমিকার দিকে প্রসারিত করতে প্রয়াসী হন। তবে এঁদের বিশেষ শিক্ষা ও অবদানও তিনি শিল্পের আলোচনায় তাঁর কাজে যথাযথ ব্যবহার করেছেন একজনউত্তরসূরির অধিকারেই। বিস্তৃত সামাজিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতীয় কলাশিল্পের বিচার তিনি পরবর্তীকালে তাঁর Mughal Court Painting : A Social and Formal Analysis (1947) গ্রন্থেও করেছেন।

নীহাররঞ্জন তাঁর এই সামাজিক তথা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিখগুদের জীবন অনুধাবন করেছেন, মধ্যযুগের পর্যালোচনা করেছেন এবং সমকালীন যুগ সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। আজ থেকে অর্ধশতাব্দীকাল আগে, যখন ইতিহাস চর্চা মানবিকী বিদ্যার শাখা হিসাবেই বিবেচিত হত, তখন তিনি সেই চর্চায় সমাজবিজ্ঞানের রীতিনীতি প্রয়োগ করে পরবর্তী কালে ইতিহাসবিদ্যাকে 'সমাজবিজ্ঞানের' অন্তভুক্ত করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এই গুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তনের জন্য ভারতীয় ঐতিহাসিকদের একটা বড় অংশ আজও তাঁর ঋণ স্বীকার করেন। এই পরিবর্তনের সার্থকতা ও অসার্থকতার প্রসঙ্গটি অবশ্যই এই নিবন্ধের বিচার্য নয়।

নীহাররঞ্জনের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর ইতিহাসচর্চার বিশেষ দিকটিকেই এখানে স্মরণ করা হল। তাঁর কাজের মূল্যায়ন আগামী কয়েক দশক ধরেই আমাদের করে যেতে হবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com